মূর্ত্তিবিজ্ঞান

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

দুর্গা মূর্ত্তি-রহস্য

যাঁহারা দুর্গাপূজাকে মূর্ত্তিপূজা মনে করেন, তাঁহারা দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। হিন্দুরা মূর্ত্তিপূজা করে বলিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমরা এই প্রবন্ধে মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম বলিয়া আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সমাজে আসিয়া গিয়াছে। প্রবল প্রচার দ্বারা এ সবের সংশোধন করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বহু প্রকারের মূর্ত্তির প্রচলন আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এক এক প্রকার মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার প্রচলন দেখিতে পাই। নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে মনে করতে পারেন যে, আমরা বুঝি বহু ঈশ্বর মানিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কথা উহা নহে। বিভিন্ন সময়ে আমাদের ঈশ্বর পূজার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তির অবলম্বন থাকিলেও আমরা একই ঈশ্বর-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমাত্মাও বলা যায়।

যে কোনও পূজাই হইক না কেন, সব পূজার মূল বিধান একরূপ। যাঁহারা পূজা বিধানের পরিচয় রাখেন, তাঁহারা ইহা ভালভাবেই জানেন। প্রত্যেক পূজাতেই সগুণ ব্রহ্মোপাসনার অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পথে ৫টি বিকাশভূমি অতিক্রম করিয়া শেষকালে করণীয় পূজা আরম্ভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ৫টি বিকাশভূমি অতিক্রম করিবার পর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। শিব, গণেশ, দুর্গা, কালী, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ - যে কোনও পূজা হউক না কেন, সগুণ ব্রহ্মের ৫টি বিকাশভূমি অতিক্রম করিতেই হইবে। বিকাশের ভূমিগুলি অতিক্রম করিবার পর ব্রহ্মজ্ঞান ভূমিলাভ হয়। ইহার পর নির্গুণ ব্রহ্ম। উহাকে এখন তুমি কালী, দুর্গা, আদি দেবতাই বল অথবা ব্যাস-বশিষ্ঠ আদি মহাপুরুষই বল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিতে উহা কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে।

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি নামক এই ৫টি বিকাশভূমিকে পঞ্চায়তন বলে। যে কোন প্রাচীন মন্দিরে এই পঞ্চায়তন বিধানে মূর্ত্তি স্থাপনা হইয়াছে দেখিতে পাইবে। ইহা বৈদিক নিয়মের বিকাশভূমিগুলি অতিক্রম করিয়া পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির বিকাশে আমাদের মনোবিকাশ, চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং কর্মপ্রতিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ‘‘ক্রমবিকাশ’’ নামক গ্রন্থে করিয়াছি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং যাঁহারা নিত্যউপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে এই পঞ্চতন্ত্র আশ্চর্য্যজনকভাবে সাহায্য করিবে।

পঞ্চায়তন সগুণ ব্রহ্মের পথের মধ্য দিয়া পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানভূমি লাভ হইবার পথকে আমরা বৈদিক ব্রহ্মোপাসনার পথ বলিতে পারি। কারণ ইহাই বেদনির্দ্দিষ্ট বিকাশপথ।

সগুণ ব্রহ্মোপাসনার পথ ভিন্ন আরও একটি অতি বৈজ্ঞানিক ও অতি সুন্দর বিকাশপথ পূজা বিধানে বিদ্যমান। ইহার নাম ভূতশুদ্ধির পথ। পূজাবিধানে ইহাকে যোগাঙ্গের বিধান বলা হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আমাদের আত্মা

আমাদের শরীরে অবস্থান করেন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা ও সহস্রার প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি ব্রহ্মনাড়ীস্থিত বিভিন্ন প্রকার মর্মকেন্দ্র। এই সব মর্মকেন্দ্রই আমাদের শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির পরিচালনা করে। আবার এই গুলির মধ্য দিয়াই আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস দ্বারা ষট্‌চক্রভেদের সব যোগাঙ্গের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। ষট্‌চক্রভদের পর যাহা লাভ হয় - উহাও ব্রহ্মজ্ঞান। ষট্‌চক্রভেদের পরই পূজা বা উপাসনা আরম্ভ হয়; কাজেই দেখা যায়, পূজামাত্রেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

পূজাবিধানে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও ভূতশুদ্ধি ক্রিয়ার মত অন্য সবগুলি বিধানই ব্রহ্মজ্ঞানের পথে নানাপ্রকার পথের আলোচনা মাত্র। এদেশে বৈদিক, তান্ত্রিক, যৌগিক এবং বেদ, তন্ত্র ও যোগাঙ্গভূত অনেক প্রকার পূর্ণজ্ঞান লাভের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পূজাবিধানে সেই সব বিকাশ-নিয়মকে পূজার ক্রিয়ারূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অতি সাধারণ দুই একটি কথার আভাষ দিতেছি -

সঙ্কল্প। পূজাঙ্গের আসল উদ্দেশ্য - বিশ্বরূপ দর্শনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, বার, অয়ন, অব্দ মিশ্রিত সঙ্কল্পের মন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া এই বিশ্ব এবং ইহার গতি কিরূপ বিধানে হইতেছে উহা বলা হয় মাত্র। সাধারণ লোক মনে করে, ইহা বুঝি মতলব সিদ্ধির কোন একটা অনুষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই অনাদি মহাশক্তিরই কল্পনা বা কল্পমাত্র। যাঁহারা খুব ভাল জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই বিশ্বসংসারে গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা জানেন। সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা উহার ঠিক ঠিক অর্থ ও লক্ষ্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অনেকে মনে করেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা মানে জীবন দান। কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপার ঐরূপ নহে। এখানে প্রাণ অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মসত্তার ব্যাপকত্বকে বুঝাইবার জন্য ‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান কারণে বিদ্যমান। এই কথাগুলিই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রে বিদ্যমান। ব্যাপক ব্রহ্মকে অনুভব কর; প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রগুলির ইহাই একমাত্র অর্থ। পূজায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রগুলির ও ক্রিয়াগুলির রহস্য দেখিলে ক্রিয়াশীলগণ দেখিতে পাইবেন, পূজাবিধান কেবল যোগ, দার্শনিকতা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝিবার কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র। প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ৫টি মন্ত্রের প্রয়োগ আছে। উহার প্রত্যেকটি মন্ত্রই ব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার সঙ্কেতমাত্র। অন্যান্য পূজাঙ্গের অনুষ্ঠানের মত ইহার কোথাও মূর্ত্তিপূজার কোনও অভাব নাই। ৫টি মন্ত্রের মধ্যে আমরা দুইটি মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব) ভূ (ইচ্ছাশক্তি) স্বরূপ। তিনি ভুবঃ (ক্রিয়াশক্তি) স্বরূপ। তিনি স্বঃ (জ্ঞানশক্তি) স্বরূপ। তিনি সবিতৃদেবতার (যে শক্তি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়) পূজনীয় তেজ (শক্তি) স্বরূপ। আমরা সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে ধ্যান করি। তিনি আমাদের মধ্যে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন।

ওঁ হংসঃ শুচিষদ্‌বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদ্‌তিথি দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।

সৎ অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম। আমরা ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রতিশব্দে তিনি (তৎ) শব্দের ব্যবহার করিব, এই মন্ত্রবাক্যটিতে 'সৎ'ই কর্ত্তা ওঁ তৎসৎ, অর্থাৎ ইহারা একটি বাচক। তিনি (ব্রহ্ম) হংসস্বরূপ (হং = পুরুষ, সঃ = প্রকৃতি)। তিনি শুচিস্বরূপ (শুচি = সূর্য্য)। তিনি বসুস্বরূপ (বসু = বিশ্বব্রহ্মাণ্ড)। তিনি অন্তরীক্ষস্বরূপ (অন্তরীক্ষ = বায়ু)। তিনি হোতাস্বরূপ (যজ্ঞে যিনি আহুতি দান করেন তিনি হোতা)। তিনি বেদিস্বরূপ (বেদি = যজ্ঞের বেদি)। তিনি অতিথিস্বরূপ (অতিথি = যজ্ঞে যাঁহারা আহারাদি করিবেন)। তিনি দুরোণস্বরূপ (দুরোণ অর্থে কলসী যাহাতে সোমরস থাকে)। তিনি নৃস্বরূপ (নৃ = মনুষ্যসমাজ)। তিনি 'বর' স্বরূপ (বর = যজ্ঞলব্ধ পুণ্য)। তিনি ঋতস্বরূপ (ঋত = সত্য)। তিনি ব্যোমস্বরূপ (ব্যোম = আকাশ)। তিনি অজঃস্বরূপ (অজ = জলজপ্রাণী)। তিনি গোজা (গোজা = পৃথিবীজাত জীবাদি) স্বরূপ। তিনি ঋতজা স্বরূপ (ঋতজা = যজ্ঞে প্রাপ্তফল)। তিনি অদ্রিজা (অদ্রিজ = পার্বত্য জীবাদি) স্বরূপ। তিনি ঋতং বৃহৎ অর্থাৎ ব্যাপক সত্যস্বরূপ।

অর্থাৎ তিনি একাধারে ব্যাপক ব্রহ্ম এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব ও বস্তু স্বরূপ। তিনি যজ্ঞক্রিয়া, যজ্ঞবেদি, যজ্ঞের হোতা, অর্থাৎ সমস্তই তিনি। এইভাবে তাঁহাকে অনুভব কর। ইহারই নাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

আমরা বলিয়াছি - সব পূজায় বৈজ্ঞানিক বিধি একই রূপ। তবে দুর্গা ও কালীপূজাই আমাদের দেশে বিস্তারিতভাবে হইয়া থাকে। অন্যান্য পূজাগুলি এত বিস্তারিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

এখন কথা হইতে পারে, পূজার বিধান একরূপ এবং পূজার লক্ষ্যও একরূপ হওয়া সত্ত্বেও এতসব মূর্ত্তিপূজার ছড়াছড়ি কেন? আমরা দুর্গামূর্ত্তি ও আর কয়েকটি মূর্ত্তির আলোচনা সহ এই কথার উত্তর দিব।

মূর্ত্তিগুলি সমাজসেবার এক এক প্রকার আদর্শজ্ঞাপক। শুধু ব্রহ্মজ্ঞান জীবনের অবলম্বন নহে। নানা প্রকার উচ্চ আদর্শে সমাজসেবাও জীবনের অবলম্বন। সমাজের প্রয়োজনে সমাজকে সব সময়েই একই আদর্শে সেবা করিবার প্রয়োজন হয় না। যখন সমাজে মহামারী আসে, তখন যেভাবে সমাজকে সেবা করিবার প্রয়োজন হয়, সমাজে যখন আসুরিক অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন সেভাবে সমাজ সেবার প্রয়োজন হইয়াছিল, আমাদের ধর্ম প্রবর্ত্তক ঋষিগণ আমাদের সেই আদর্শের দিকে সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

এইজন্যই নানাপ্রকার সমাজসেবার আদর্শজ্ঞাপক মূর্ত্তিতে আমরা একই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন বা ঈশ্বরভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকি। বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তিতে আমরা কেবল বিভিন্ন প্রকারের সমাজসেবার আদর্শই শিক্ষা করি না; কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের রীতি-নীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বুঝাইবার জন্যও অনেক মূর্ত্তির প্রচলন হইয়াছে। পূজা বিধানের সাধারণ নিয়মগুলি এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি,

দর্শন, যোগ, জ্যোতিষ ও নানাপ্রকারের রীতিনীতির প্রত্যক্ষ অনুশীলনের সুযোগ লাভ করি এবং মূর্ত্তিগুলি দ্বারা সমাজসেবার আদর্শ বুঝিয়া থাকি।

যে দেশ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দার্শনিকতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে দেশের লোক যদি সমাজসেবার উচ্চ ও মহান্ আদর্শে ভুল করে তবে সে জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে; এজন্য মূর্ত্তিদ্বারা সমাজসেবার শক্তিশালী আদর্শের শিক্ষাদান এবং পূজাবিধানে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও যোগাদির অনুশীলন পাশাপাশি স্থান পাইয়া আমাদের ধর্ম-প্রবর্ত্তকগণের দূরদর্শিতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

সমাজে যখন কোনও আসুরিক বা বর্বর প্রকৃতির মানুষ বা দল রাজশক্তির কর্ণধার হয়, তখন কিভাবে সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে এবং কিভাবে সেই অসুরকে ধ্বংস করিয়া সমাজকে নিষ্কণ্টক করিতে হইবে - সেই মহান্ আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য দুর্গামূর্ত্তির প্রচলন হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে - অর্থাৎ বৈদিক যুগে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের রাজত্বকালে প্রথম সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য এই আদর্শ প্রবর্ত্তিত হয়। সমাজের সমস্ত বিক্ষিপ্ত জনমতকে একত্রিত করিয়া দেশের মহিষাসুরের (মহিষের মত বর্বর পশুর) রাজত্ব ধ্বংস করা হইয়াছিল। মহিষাসুর একজন মানুষই ছিল, কিন্তু মহিষের মত সে বর্বর ও যুক্তিহীন গুণ্ডা ছিল বলিয়া তাহাকে মহিষাসুর নাম দেওয়া হইয়াছিল এবং উহার রাজত্ব ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সমাজের ও জাতির সমস্ত জ্ঞান, কর্ম ও সঙ্ঘশক্তি একত্রিত করা হইয়াছিল। এই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই ‘দুর্গামূর্ত্তি’।

দুর্গামূর্ত্তি দেখিলেই এ সব কথার স্পষ্ট আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডী নামক গ্রন্থে এই সংগঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমাজে বিপ্লব আমাদের দেশে অনেকবার হইয়াছে। বর্তমান সময়ের পাকিস্থানীদের বর্বরতা মহিষাসুরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ বৎসরের দুর্গাপূজা হিন্দুগণকে কি শিক্ষা দিবে উহা আগামী কয়েক মাসের ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। আমরা প্রতি বছর দুর্গাপূজা করিয়া থাকি। এই দুর্গাপূজা ভারতের প্রত্যেক প্রান্তেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামের কোণে কোণে দুর্গাপূজার আনন্দ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন দেশের মাটিতে আজ নারীর অপমান নির্য্যাতন গৃহদাহ লোক বিতাড়ন হইয়া দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নেতারা ও যুবকরা কম্যুনিজম্, সোসিয়ালিজম্, ডেমোক্রেসী প্রভৃতি পশ্চিমী মতবাদের বুলি আওড়াইয়া এই দুঃসময়ে দূরে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছেন। একটা জাতের কি ভীষণ দুর্দশা ও অধঃপতন তাহাদের নেতারা ও পত্রিকাওয়ালারা আনিয়া দিতে পারে, আমরা বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। লক্ষ লক্ষ বৎসরের দুর্গোৎসব হিন্দুর জাতীয় জীবনে আজ ব্যর্থতার প্রতীক রূপেই ....

....

বাইবেলেও মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে উস্কানী আছে। গড্ ও কয়ামত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ‘ইশাই’গণকেও মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলিতে দেখা যায়। কিন্তু যে গড্ একটা ন্যায় বিচার করিতে শক্তি রাখেন না, তাঁহাকেও আমরা কোন যোগ্য ব্যক্তি মনে করিতে পারি না। “কয়ামত কালে গডের ‘পু’ বাজিবে আর কবর হইতে মৃতগণ উঠিয়া

দাঁড়াইবে। তাহারা গডের নিকট বিচারের জন্য নীত হইবে। ‘গড’ তাহাদিগকে বিচার করিয়া কাহারও জন্য অনন্ত কালের নরক এবং কাহারও জন্য অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।’’

এইরূপ যুক্তিহীন কথায় বিশ্বাসকারী লোকেরাও হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করিতে সাহস পায় ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা। মানুষ মাত্রেরই কর্ম্মে কিছু না কিছু মন্দ কর্ম থাকে। আবার মহাপাপীও একদিন সামান্য ভাল কাজ করিয়া থাকে। ফলতঃ পাপ পুণ্য মিশ্রিত কর্ম সব মানুষেই থাকে। যদি কাহাকে পাপের ফল না দিয়া স্বর্গে পাঠানো যায় তবে তাহার উপর ন্যায় বিচার হইল না। আবার কাহারও পুণ্যের ফল না দিয়া নরকে যদি পাঠানো যায় তাতেও তাহার পুণ্যের ফল দেওয়া হইল না। কাজেই দেখা যাইতেছে গড্ একজন সাধারণ মানুষের মতও বিচার করিতে পারেন না। হিন্দুদের ঈশ্বর ব্যাপক বিচার অবিচারের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। সমাজকে সেবা করিলে তাহারই সেবা হয়। সেই সব আদর্শ বুঝাইবার জন্যই আমরা মূর্ত্তি গড়িয়া থাকি। যাহারা গডের ভ্রান্ত বিচারে বিশ্বাসী তাহাদের মত মূর্খ মূর্ত্তিবিজ্ঞানের কি বুঝিবে। হিন্দুরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করে উহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। এই নির্গুণ ব্রহ্ম (বা সগুণ ব্রহ্ম) মানুষের কৃতকর্ম্মের বিচার বা অবিচার কোন কার্য্যেই জড়িত নহেন। মৃত আত্মার বিচার করা যম রাজার কাজ। তিনি আমাদের ঈশ্বরও নহেন। গড বা আল্লাহ্ প্রেতের বিচারক যমরাজা তুল্য হইলেও যমরাজার বিচার ন্যায় বিচার, কিন্তু গড্ বা আল্লাহ্‌র বিচার অবিচার মাত্র।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি পূজা বিধানের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মূর্ত্তি পূজার নাম গন্ধহীন নানা প্রকারের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান মাত্র এবং মূর্ত্তিগুলি সমাজ সেবার নানা প্রকার আদর্শ মাত্র। কাজেই আমরা নির্ভয়ে ঘোষণা করিতে পারি - মূর্ত্তি নিন্দুক মতবাদ মাত্রই মূর্খতার এবং অজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

এবার আমরা আরও কয়েকটি মূর্ত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

হনুমান মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ভারতের সব স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এক হস্তে গদা ও অন্য হস্তে প্রস্তর খণ্ড লইয়া নারীর সতীত্ব নষ্টকারী দুষ্ট রাবণকে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইনি ব্রহ্মচারী বেশধারী বীরপুরুষ। এই মূর্ত্তি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, নারীকে মায়ের মত শ্রদ্ধা কর, নারীর সম্মান নাশকারীকে পাথর ও গদা মারিয়া ধ্বংস কর। বর্ব্বরকে দয়া করিও না।

শীতলা মূর্ত্তি। একটি মহিলা, একটি গর্দ্দভ, একটি ঝাড়ু, একটি জলপূর্ণ কলসী ও একটি কুলা এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। কলেরা ও বসন্ত নিবারণ কল্পে শীতলা পূজা করা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে গর্দ্দভ সহর ও গ্রামের কুড়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কুলা করিয়া ময়লা উঠাইয়া লও। ঝাড়ু দ্বারা সব বাড়ী ঘর, পথ ঘাট পরিষ্কার কর। ঝাড়ু ও জল দ্বারা নর্দ্দমা ধৌত কর এবং সাফ কর। এই ভাবে সব সাফ রাখিবার আদর্শে সমাজ সেবা কর, এইরূপ মহামারী হইবে না।

নারায়ণ মূর্ত্তি। সমাজকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হয় সেই আদর্শ এই মূর্ত্তিতে দেখানো হইয়াছে। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী। নরে যিনি ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান

তিনি নারায়ণ। অর্থাৎ নর সমাজই নারায়ণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর বা অন্যায়ের সমালোচনা কর ইহার নাম শঙ্খ। সমাজকে সংঘবদ্ধ রাখ ইহার নাম চক্র। গদাঘাতে গুণ্ডা ও বর্ব্বরকে চুরমার কর ইহার নাম গদা। এইভাবে সমাজকে শক্তিশালী রাখ, ইহাতেই সমাজে শান্তি থাকিবে। এই শান্তির নাম পদ্ম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূজার বিষয় সব পূজায়ই একরূপ এবং মূর্ত্তিগুলি সমাজ সেবার কতগুলি আদর্শ মাত্র। কেবল যোগ ধ্যানই ঈশ্বরোপাসনা নহে, সমাজকে শক্তিশালী রাখ এবং সমাজকে প্রয়োজন বোধে নানা প্রকারে সেবা কর। এ দুই এর সামঞ্জস্যই 'ঈশ্বর ভক্তি'। আশাকরি হিন্দুগণ ও অহিন্দুগণ দুর্গামূর্ত্তির রহস্য এখন বুঝিতে পারিলেন।

বিজয়া

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার শেষ অধ্যায়ের নাম 'বিজয়া'। দুর্গাপূজা না বুঝিলে 'বিজয়া' বুঝা যায় না। আমাদের দেশে যত পূজা হয়, তাহার মধ্যে একমাত্র দুর্গাপূজা ভিন্ন অন্য কোন পূজায় 'বিজয়া' নামক কোন অধ্যায় পূজার শেষে নাই। এ দেশে বৎসরে দুইবার দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। একবার শরৎকালে এবং অন্যবার বসন্তকালে। বসন্তকালের পূজা অপেক্ষা শরৎকালের পূজাকে আমরা বেশি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকি।

দুর্গাপূজার এই শুক্লপক্ষকে দেবীপক্ষ বলে। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত এই নয় দিনের নাম নবরাত্রি। দুর্গাপূজা এবং নবরাত্রি না বুঝিলে 'বিজয়া' বুঝা যায় না।

দুর্গাপূজা আমাদের হিন্দুদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস জড়িত উৎসব। যখন আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে আসুরিক উৎপাত অত্যন্ত ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে, তখনই আমাদের সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উহার সম্মুখীন হইয়াছে। এবং যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজই 'দুর্গামূর্ত্তি' এবং শত্রু ধ্বংসই 'বিজয়া'।

বিষ্ণুর অনন্তশয্যা। অসুরের বিরুদ্ধে সমাজব্যাপী একটা বীরত্বের উদ্বোধনই আমাদের দুর্গাপূজার এই বোধন উৎসব। শ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ইহার রহস্য স্পষ্ট করা হইয়াছে। বিষ্ণু অর্থে সমাজের মধ্যস্থিত ব্যাপক 'চেতনা'। সমাজ কখনও 'চেতনা' সম্পন্ন থাকে এবং সমাজ কখনও বা 'নিদ্রিত' হয়। যখন সমাজ নিদ্রিত হয়, তখন সমাজের কোন কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে না। আমাদের বর্তমান অহিংসাবাদী হিন্দু সমাজকে আমরা অনেকটা নিদ্রিত সমাজ বলিতে পারি। তাঁহারা হিন্দুত্ব এবং শক্তিবাদিত্ব দুইই ভুলিয়া গিয়াছেন। সমাজের নেতা ও সমাজ এসময় একটা সাংঘাতিক নিদ্রিত যুগ অতিক্রম করিতেছে। বিগত ২৫ বৎসর যে দানবীয় অত্যাচার, নারী নির্য্যাতন, গৃহদাহ, গৃহ নিষ্ক্রান্তি, দেশত্যাগ, অসভ্যতা, বর্বরতা আমাদের সমাজের উপর দিয়া চলিয়াছে এবং নেতারা যে ভাবে এই সব বর্বরতা সহ্য করিয়াছেন, উহার দিকে তাকাইলে

আমাদের সমাজ জীবনের নিদ্রার যুগের একটা লম্বা ইতিহাস পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে সমাজ জীবনের উপর একটা বোধনের ঊষার আলোক উদ্ভাসিত হইতে চলিয়াছে। আগামী ২।১ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্গাপূজার অধ্যায় আরম্ভ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। নিদ্রাচ্ছন্ন নেতার যুগ শীঘ্রই শেষ হইবে এবং জাগ্রত নেতারা আমাদের সমাজের পরিচালনা করিবেন। মহিষাসুর ধ্বংস হইবে।

শীঘ্রই সময় আসিতেছে, যখন ভারতের জ্ঞানী, ঋষি ও মহাত্মাগণ এই জাতীয় বোধনকার্য্যে আরও বিপুল বেগে আত্মনিয়োগ করিবেন। এ জাতি জাগিবে। ১000 বৎসরের অপমান, নারী ও মন্দির অপবিত্র করণের ইতিহাস একটা বর্ব্বর সমাজকে কি ভাবে এই পৃথিবী হইতে মুছিয়া দেয় সময় উহার প্রমাণ দিবে। হিন্দুর সমাজ জীবনে তথাকথিত ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম, অহিংসাবাদ, সোস্যালিজম সবই নিদ্রাচ্ছন্ন সমাজের রোগ বিকার মাত্র। এই সমাজের আসল রূপ ‘শক্তিবাদ’।

কি ভাবে একটা সমাজের বোধন হয়, কি ভাবে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বর্ব্বর সমাজকে ধ্বংস করে এবং সমাজ শান্তি লাভ করে এই তিনটি ঘটনাই দুর্গাপূজার বোধন, পূজা ও বিজয়া। ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পূজন এবং দশমীতে বিজয়া। ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে যুদ্ধ এবং দশমীতে বিজয়া। ইহাই আমাদের দুর্গোৎসব।

৯মী পর্যন্ত নয় দিন জাতীয় জীবনে অত্যন্ত দুঃসময়। সত্য যুগে বা বৈদিক যুগে আমাদের সমাজ প্রথম দুইবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই দুইটা নবরাত্রিই শারদীয় ও বাসন্তী নবরাত্রি। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে এই নয় দিন অত্যন্ত সাংঘাতিক সময়। ইহার মধ্যে ৭মী, ৮মী ও ৯মী আরও সাংঘাতিক সময়। যুদ্ধ যখন অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই তিনটি দিনই ৭মী, ৮মী, ৯মী নামে খ্যাত। ‘রাত্রি’ শব্দের অর্থই অত্যন্ত দুর্দ্দিনের সময় বা অত্যন্ত সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ। যুদ্ধ যখন চরমে যায়, তখন উহাকে অত্যন্ত দুর্দ্দিনের সন্ধিক্ষণ বলা যায়; আবার অত্যন্ত দুর্দ্দিনের সময়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমত্তারও প্রমাণ হইয়া থাকে। এই শক্তিমত্তার শেষ অধ্যায়ে ‘বিজয়া’।

আজ স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব দেখিয়া কেহ বেশী উল্লসিত হইও না। এক হাজার বৎসরের বর্ব্বরতা এই দেশের যে দুর্দ্দশা করিতে পারে নাই আজ স্বাধীন ভারতের অযোগ্য নেতারা উহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতম দুর্দ্দশা কোটী নরনারীর জন্য কয়েক মাসে আনিয়া দিয়াছেন। যে পাঞ্জাব হিন্দু সভ্যতার আদি ভূমি, আজ সেই পাঞ্জাব হিন্দুহীন। যে সীমান্ত ভারতের প্রবেশদ্বার পাহারা দিবে সেই সীমান্ত হিন্দুহীন। যে সিন্ধু নামের সহিত হিন্দু জাতির নাম জড়িত, সেই সিন্ধুর হিন্দুরা পলায়নপর, অপমানিত ও লাঞ্ছিত। যে পূর্ব্ববঙ্গ ভারতের মুক্তি যুদ্ধে প্রথম যোদ্ধা, সেই পূর্ব্ববঙ্গ আজ রাহুগ্রস্ত। তোমরা যদি মাটীর দুর্গাপূজা করিয়া থাক, তবে তোমরা মাটিই হইয়া যাইবে। মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য মাটির মূর্ত্তিই গড়িয়াছিলেন; কিন্তু পূজা করিয়াছিলেন শক্তির এবং দান করিয়াছিলেন গায়ের রক্ত। সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা আমাদের দেশে শক্তিবাদিতারই পূজা। ইহা আধুনিক পূজা নহে, ইহা অত্যন্ত প্রাচীন পূজা। বেদে এই পূজার কথা উল্লেখ আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের সমাজ এই

সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল যে, শক্তিবাদিতাই আমাদের জাতির জাতীয়তা। ইহার নিজস্ব রাজনীতি আছে (শক্তিবাদ নামক পুস্তক দেখুন)।

বর্ব্বরবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই 'দুর্গাপূজা' এবং বর্ব্বরবাদ উচ্ছেদ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠাই 'বিজয়া'। আজ দুর্গাপূজা ও বিজয়ার দিনে তোমরা পশ্চিমপাঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাই বোনদের প্রতি নিজেদের কর্তব্যে অটল থাকিও। যে সব বাকপটু ভণ্ডনেতারা দুই প্রান্তের হিন্দুগণকে মহাদুঃখে ফেলিয়া দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিও; 'বিজয়া'র স্মৃতি উৎসব তবেই সাফল্য লাভ করিবে। যেমন পূজাতত্ত্ব না বুঝিলে 'আরতি' বিজ্ঞান বুঝা যায় না, ঠিক সেইরূপ অসুরবাদ ও বর্ব্বরবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য 'যুদ্ধ' না বুঝিলে দুর্গাপূজা বুঝা যায় না এবং যুদ্ধে বিজয় না বুঝিলে 'বিজয়া'ও হয় না। দুর্গাপূজা ও বিজয়া আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রথম যুগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিজয় বিজ্ঞানের স্মৃতি মাত্র। তোমরা সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ ও বিজয়ার জন্য প্রস্তুত হও। শক্তিবাদই বিজয় আনিয়া দিবে। শক্তিবাদই সমাজে জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ঋদ্ধি আনিয়া সমাজের প্রতি পদে সমান ভাবে বণ্টন করিবে। শক্তিবাদের ফলই 'বিজয়া'।

কালী মূর্ত্তি রহস্য

আমাদের দেশে যে সব মূর্ত্তি বর্তমান সময়ে বেশি প্রচলিত উহাদের মধ্যে শিবমূর্ত্তি সবচেয়ে প্রাচীন। ইহার পরই কালী মূর্ত্তিকে প্রাচীন মূর্ত্তি বলা যায়। শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে মূর্ত্তি নিন্দুক সম্প্রদায় অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে। আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদী সম্প্রদায়ও যোগতত্ত্বকে সাধারণ লোক হইতে দূরে রাখিবার জন্য শিবমূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। মস্তিষ্কসহ মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না মার্গই শিবমূর্ত্তি। এই সম্বন্ধে বহুশাস্ত্র প্রমাণ এবং বহু বৈজ্ঞানিক চিত্র সাহায্যে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ধর্মশিক্ষা নামক গ্রন্থে করিয়াছি। মস্তিষ্কের জ্ঞান অংশ এবং মেরুদণ্ড মধ্যগত সুষুম্না ও মর্মাংশের মোটামুটি আভাষ শিবমূর্ত্তিতে বিদ্যমান।

যতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় উহার সবগুলিই তান্ত্রিক যোগীদের দ্বারা পরিকল্পিত। যোগতত্ত্ব, দার্শনিকতা, শরীরতত্ত্ব, গ্রহ, নক্ষত্রাদি, রাগ ও সঙ্গীতাদির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মূর্ত্তিকলার মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে শিব ও কালী মূর্ত্তি সবচেয়ে অধিক রহস্যপূর্ণ। দুর্গামূর্ত্তি হইতেও কালী মূর্ত্তির রহস্য অধিক গম্ভীর। ইহাতে যোগ রহস্য, বেদান্তের ব্রহ্মবাদ রহস্য এবং কর্মক্ষেত্রে শক্তিবাদ, সবই একাধারে বিদ্যমান। দুর্গামূর্ত্তি আলোচনাকালে আমরা ইহা ভাল ভাবেই দেখাইয়াছি যে মূর্ত্তিগুলি বিভিন্নস্তরের অনুভূতি ও সমাজ সেবার কতকগুলি আদর্শকে শিক্ষা দিবার জন্য

প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু পূজা বিধানের উপাসনা একই ঈশ্বরের বা আত্মার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চলিত কথায় যাহাকে ত্রিকাল বলে উহার সমষ্টিই কালী। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নামক তিনটি কালের ক্রিয়ার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া চলিয়াছে। কালী বলিতে কেবল ত্রিকালই বুঝায় না, তুরীয় কালও কালী নামে খ্যাত।

সহস্র যুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিযুগ সহস্রান্তং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ান্ততত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥

সহস্রযুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার দিন থাকে (অর্থাৎ সহস্র যুগ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ক্রিয়া চলিতে থাকে)। এবং সহস্রযুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি থাকে (অর্থাৎ সহস্র যুগ সৃষ্টির সমস্ত উপাদান অব্যক্তের অন্ধকারে নিমগ্ন বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে)। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন তাঁহারাই ঠিক ঠিক রাত্রি ও দিনের জ্ঞাতা।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভাবত্যহরাগমে॥ গীতা ৮।১৯॥

জীব ও জগৎ এইভাবে দিনের বেলায় উৎপন্ন হইতে থাকে (অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয় চলিতে থাকে)। কিন্তু রাত্রিকালে এই সৃষ্ট্যদি ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

কালের এই নিয়ম, এই নিয়মই কালী। এই নিয়মের পর পারে আরও এক সত্তা বিদ্যমান। তাঁহার প্রকাশে ঐ দিন রাত্রি সংজ্ঞক কালের অস্তিত্বই মিথ্যা হইয়া যায়। তিনিই কালিকা বা নির্গুণ ব্রহ্ম। কাল যাঁহার সত্তায় কলিত হইয়া যায় তিনিই ‘কালিকা’। কাল + ই (বা ঈ) = কালী। যাহা সমস্ত বস্তু কলন কারী উহার নাম কালী। ই = বিদ্যাশক্তি, কালী = কালরূপা বিদ্যাশক্তি। কালরূপা বিদ্যাশক্তিকে যিনি কলন করেন তিনিই ‘কালিকা’ বা নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে যদি আমরা দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ না করিয়া মূর্ত্তি সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে আমরা নিশ্চয়ই কালী মূর্ত্তি গড়িতে বাধ্য হইব। কালী মূর্ত্তিতে বেদান্ত কিরূপে স্থান পাইয়াছে উহা দেখান যাইতেছে। বেদান্তের প্রথম সূত্র :- “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” প্রশ্ন করা যাইতেছে ব্রহ্ম কি? বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। “জন্মাদ্যস্য যতঃ”। অর্থাৎ যাহা হইতে জন্মাদি বা সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। কালী মূর্ত্তির নিম্ন মধ্য ও ঊর্দ্ধ অঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বিজ্ঞান দেখানো হইয়াছে। কালীর নিম্ন অঙ্গে ‘সৃষ্টি’ (“মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং” কালীধ্যান দেখ)। কালী মূর্ত্তির মধ্য অঙ্গে বিশ্ব পালনের অলঙ্ঘনীয় আদর্শ এবং অসুর নাশের বিজ্ঞানও দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ অসুরের বিনাশ সাধন না হইলে বিশ্বপালন হয় না। অসুর নাশের আদর্শ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কালীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধ অঙ্গে বিশ্বনাশের আদর্শ বিদ্যমান। ঊর্দ্ধ অঙ্গে মুখে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে উদ্যত। (করাল বদনাং ঘোর রাবাং, মহারৌদ্রীং, লোলজিহ্বাং)। (কালী ধ্যান দেখ)। কালীর নিম্ন অঙ্গে সৃষ্টি, মধ্য অঙ্গে পালন ও অসুর

নাশন এবং ঊর্দ্ধ অঙ্গে বিশ্বলয়ের নিয়মগুলি স্পষ্ট করা হইয়াছে। ঊর্দ্ধ অঙ্গে কেবল লয়ের কথাই নাই, সেই অঙ্গে জ্ঞান লক্ষণও স্পষ্ট করা হইয়াছে। আমরা পরে এ সম্বন্ধে বলিতেছি। কালীমূর্ত্তিতে আমরা ব্রহ্মোপাসনার আদর্শমাত্র শিক্ষা করিয়া থাকি। বেদান্ত দর্শনে যাহা আছে কালী মূর্ত্তিতেও তাহাই আছে। বেদান্তে যে নিয়মে ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে কালীমন্ত্রেও ঠিক সেই কথাই বলা হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সব স্পষ্ট করিয়া দিব।

বেদান্তের ‘‘জন্মাদি’’ (জন্ম, পালন, লয়) এবং তন্ত্রের ‘‘ইচ্ছা ক্রিয়া, তথা জ্ঞান’’ একার্থ বাচক। বেদের গায়ত্রী উপাসনায় ‘‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ’’ও সেই কথাই নির্দ্দেশ করে। কালীর উপাসনার অর্থে সৃষ্টি (ইচ্ছা), স্থিতি (ক্রিয়া) ও লয় (জ্ঞান) নামক ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ সম্পন্ন এক ব্যাপক মহাশক্তির উপাসনা। বেদান্তের ব্রহ্মোপাসনা এবং বেদ নির্দ্দিষ্ট গায়ত্রী উপাসনাও এই একই তত্ত্বের নির্দ্দেশক। বেদান্তমতে যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব, তন্ত্রমতে উহাই কালী এবং সংহিতার (বেদের) গায়ত্রী উপাসনা ঐ একই তত্ত্বেরই উপাসনা। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সবই কালের খেলা। কাজেই ব্রহ্মকে কালীও বলা যায়।

বেদান্তের জন্মাদি কালীমূর্ত্তিতে বুঝা গেল। কিন্তু অতঃ অর্থাৎ যাহা হইতে কথাটি কালীমূর্ত্তিতে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কালীর অন্য নাম কালিকা। অর্থাৎ কালকে যিনি কলন করেন। ত্রিকাল + তুরীয় কাল = কালী। এরূপ ব্যাপক কালকে যিনি কলন করেন তিনি কালিকা। কেবল সৃষ্ট্যাদির সমষ্টিই কালী নহে। সৃষ্টির সাম্যাবস্থা যাহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শক্তি (‘‘ঘোরাং’’ কালী ধ্যান দেখ) তাহাও কালী। অব্যক্ত কাল (সাম্যাবস্থাকাল) ও ব্যক্তকাল (সৃষ্ট্যাদি) যাহার দ্বারা কলিত হয় উহাও কালী। ঐ কালিকা হইতেই তুরীয় কাল ও সৃষ্ট্যাদি কাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কালিকা ঠিক ঠিক নির্গুণ ব্রহ্ম নামে খ্যাত।

কালীমূর্ত্তির মধ্যে অবস্থিত অসুর নাশন শক্তির আভাষ দেওয়া যাইতেছে। কর্মক্ষেত্রে একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা কিরূপ কর্মের নির্দ্দেশ দেন, কালীমূর্ত্তির মধ্য অঙ্গে উহা ব্যক্ত হইয়াছে। কালীমূর্ত্তির মধ্য অঙ্গ কোমর হইতে কণ্ঠের নিম্ন পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। এই অংশে নরকর সমষ্টিতে কালীর কোমরবন্ধ রহিয়াছে। ‘কর’ অর্থে হস্ত বা কর্ম শক্তি। সমষ্টির কর্মশক্তিতে কোমর বাঁধ। কথায় বলে কোমর বাঁধিয়া কর্মে লাগো বা যুদ্ধে অগ্রসর হও। নির্ভয়ে এবং সমবেত ভাবে যুদ্ধে লাগিয়া থাক। ‘‘তস্মাদ্ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ’’ গীতা। সব সময় আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ কর। কালীর বাম হস্তদ্বয়ে এইমাত্র ছিন্ন হইয়াছে এরূপ একটি রক্তধারা সংযুক্ত অসুরমুণ্ড ও সদ্য রক্তমাখা খড়্গ রহিয়াছে। অর্থাৎ অসুর মাথা তুলিলেই নির্ভয়ে খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ড নিপাত করিবে। ‘‘সদ্যশ্ছিন্নঃ শিরঃ খড়্গঃ’’ (কালীধ্যান দেখ)।

অসুর সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ কেবলই তন্ত্রের নির্দেশ নহে, ইহা সংহিতার নির্দ্দেশ। সংহিতার নির্দ্দেশ আরও কঠোর। ইহা গীতারও নির্দ্দেশ। কালীমূর্ত্তি, দুর্গামূর্ত্তি, গীতা, চণ্ডী ও বেদ একই কর্ম্মনীতি ও তত্ত্বের জ্ঞাপক। ইহার যে কোন একটি বুঝিলেই হিন্দু ধর্ম্মকে বুঝা যায়। বৌদ্ধবাদের পতনের পর আমাদের দেশের একদল ভাববাদী মহাত্মা ও পৌরোহিত্যবাদী একদল ব্রাহ্মণ আমাদের গীতা, শক্তি ও বেদ-বাদ মূলক ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কেবলই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ, শক্তিবাদী

সাধক এবং বেদবাদী সমাজ হিতৈষীদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ইহার সংশোধন করিতে বলিতেছি। কংগ্রেসী প্রবর্ত্তিত অহিংসবাদ ও তাঁহাদের অনুসৃত বর্ব্বর তোষণবাদ, আজ ভারতকে এক ভীষণ সঙ্কটকালে ফেলিয়া দিয়াছে। একমাত্র শক্তিবাদী ভারতই এই সঙ্কটকাল অতিক্রম করিতে পারে।

দেবীর দক্ষিণ হস্তে 'বরদান ও অভয়দান' কর্ম্মচিহ্ন বিদ্যমান। (অভয়ং বরদঞ্চৈব)। বর এবং অভয় গুরুর কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞান কেবল নিজেই অর্জ্জন করিবে না, ইহা সমাজে শিক্ষাদান করিবে। ইহা দ্বারা সমাজের মঙ্গলকারীদের সংখ্যা ও তাঁহাদের যুক্তিবাদিতা বৃদ্ধি করিবে। বাম অর্থে সমাজের শত্রুপন্থী বা বর্ব্বরপন্থীদিগের জন্য কর্মনীতি ও দক্ষিণ অর্থে সমাজের মিত্র পন্থীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মনীতি। সমস্ত বেদ ও বেদান্ত একবাক্যে যাহা নির্দ্দেশ দিয়াছেন কালীর ধ্যানে সেই কর্ম্মনীতি ও জ্ঞাননীতি যুগপৎ বিদ্যমান। বেদের একান্ত নির্দ্দেশ সমবেতভাবে কর্ম্ম করিবে এবং সমবেতভাবে উপাসনা করিবে। কালীর মধ্য অঙ্গে সেই নির্দ্দেশ বিদ্যমান। সমাজে যাহাতে যুগযুগান্তর ধরিয়া জ্ঞান, যুক্তিবাদিতা ও নিষ্পক্ষ বিচারজ্ঞান প্রবর্ত্তিত থাকে এজন্য জ্ঞানী ও ঋষিগণ সমাজে জ্ঞানশিক্ষা দান করিবেন এবং সমাজকে অসুর নিধনে উৎসাহিত করিবেন। কালীর ঊর্দ্ধ অঙ্গে কেবল জ্ঞান বিধানই দেখান হয় নাই। ইহাতে একজন জ্ঞান-শক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সব লক্ষণ বিদ্যমান। ''কালীর তিন চক্ষু'' (লোচনত্রিতয়ান্বিতাং) অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাদের ত্রিকালদর্শিতা কিছু না কিছু থাকিবেই। আজ আমাদের দেশে এক দল বিচিত্র মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা আজ একটি কথা বলিলে তিন দিন বাদেই দেখা গিয়াছে ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। যিনি অসুর নাশের শিক্ষা দেন এবং যিনি ত্রিকালদর্শী তিনিই ঠিক ঠিক মহাত্মা। কে পোকা মারে না বা ছারপোকা উকুন মারে না বা কে ১০ দিন নির্জ্জলা বা সজলা উপবাস করিতে পারেন এ সকলকে মহাপুরুষের লক্ষণ ধরা যায় না। যাঁহাদের ভুলের জন্য একটা সমাজে মা বোনের সতীত্ব বর্ব্বরের নিকট বিসর্জ্জন দিতে হয়; যাঁহাদের দুর্ব্বল নীতির জন্য ধন মান জাতি ধর্ম্ম সমস্ত বর্ব্বরদের চাপে হারাইয়া যায়, যাঁহাদের নির্দ্দেশে চেলারা বর্ব্বরতোষণে সিদ্ধহস্ত হন এমন মহাপুরুষদিগকে মহাসুর ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।

'কালিকা বঙ্গদেশেচ'। অর্থাৎ বঙ্গদেশে কালীই উপাস্য শক্তি। বাঙ্গালী আজ তাহার শক্তিবাদমূলক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অহিংসা ও তোষণ ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছে, তাই বাঙ্গালী আজ ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বাঙ্গলার পত্রিকাগুলি টাকার লোভে নিজের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া নপুংসক ধর্ম্মে ও বর্ব্বর তোষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহারা টাকার লোভে বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলার যুবকগণ নিজের ধর্ম্মত্যাগ করিয়া সোসিয়ালিসম্, কম্যুনিসম্ শিক্ষা করিতেছে এবং নিজের মা বোনকে নিঃসহায় করিয়া বর্ব্বরদের হাতে লাঞ্ছিতা হইতে দিতেছে। বাঙ্গালী আজ কোথায় আছে কে জানে। বাঙ্গালী যদি আজ একটা দিনও এসব নেতা, পত্রিকা, মহাত্মা, কর্ম্মী ও পাশ্চাত্য কর্ম্মনীতির অনুসরণ করে তবে তাহার মৃত্যু সন্নিকটে। বাঙ্গালী মনে রাখিও ''ধর্ম্মং রক্ষতি রক্ষিতঃ''। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে সে রক্ষা পায়। শক্তিবাদিতা কেবল

বাংলার ধর্ম্মই নহে ইহা সমস্ত হিন্দু জাতিরই ধর্ম্ম। বেদ, গীতা, তন্ত্র, যোগ, কালীপূজা, দুর্গাপূজা, গায়ত্রী উপাসনা সবই শক্তিবাদিতা মাত্র।

কালীমূর্ত্তির নিম্নে এক শিবমূর্ত্তি আছে। ইনি ‘‘শবরূপ’’ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ ব্রহ্মের বুকের উপর সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও তুরীয় শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছে। (‘শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং,’ কালীধ্যান দেখ)। কাল + ইপ্‌ = কালী। কালের ব্যাপকত্ব আরও অগ্রসর হইয়া দেখ সেখানে কালের ক্রিয়াই থাকিবে না। তিনি মহাকাল বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এই নির্গুণ শবরূপ ব্রহ্ম হইতেই প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টির বীজ আকর্ষণ করেন। ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে সৃষ্টি + স্থিতি + লয় + তুরীয় + মহাকাল বা নির্গুণ ব্রহ্ম = কালীমূর্ত্তি; এমন দার্শনিক ও ব্যাপক ব্রহ্মজ্ঞান নির্দ্দেশক মূর্ত্তি আমাদের দেশে আর একটিও নাই।

কালীর গলায় ৫১টি মুণ্ড বিশিষ্ট এক মালা বিদ্যমান। মুণ্ডমালা অর্থে জ্ঞানাধার দ্বারা প্রস্তুত মালা। অ আ ইত্যাদি ৫১ বর্ণই ধ্বনি জগৎ বা শব্দ ব্রহ্ম। এই ধ্বনিগুলিই জ্ঞানের প্রতীক। তন্ত্রে ৫১টি বর্ণমালাকেই মুণ্ডমালা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে মহাশক্তির উপাসনা করা হইতেছে সেই মহাশক্তি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে সজ্জিতা। বেদান্তের দুইটি সূত্র আমরা কালী মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছি। এবার আমরা বেদান্তের তৃতীয় সূত্রের কথা বলিব। ‘‘শাস্ত্র যোনিত্বাৎ’’। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র বা জ্ঞানের যাহা উৎপত্তি স্থল উহার নাম ব্রহ্ম। সমস্ত প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষের বহির্বিকাশ। এই চিন্তাশক্তি আমাদেরই আত্মারই আশ্রয়ে অবস্থান করে। সাধকগণ জানেন আত্মাই ব্রহ্ম বা কালী। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন কালী সাধক মাত্রেই জ্ঞানী হইয়া থাকেন (অবশ্য ব্রহ্মচারী ও ত্যাগী হওয়া চাই)।

মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। এই ব্রহ্মনাড়ী সংযুক্ত মর্ম্ম কেন্দ্রগুলিই ষটচক্র নামে খ্যাত। আমাদের মস্তিষ্কটি ষটচক্রের অন্তর্গত একটি চক্র। এই ষটচক্রের এক একটি চক্রে এক এক প্রকার জ্ঞান শক্তি বিদ্যমান। আমাদের মধ্যে লৌকিক বা অলৌকিক যত প্রকার জ্ঞানী বা বিজ্ঞানী থাকুন না কেন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডই তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কারণ। যোগশাস্ত্র আলোচনা কালে পাঠক দেখিতে পাইবে ষটচক্রের প্রত্যেকটিতে এক একটি করিয়া বর্ণ বিদ্যমান। এই ব্রহ্মনাড়ীই আমাদের আত্মা ইনি কালী বা ব্রহ্ম। কালীর মুণ্ডমালার এক একটি মুণ্ড এই ৫১টি মাতৃকা বর্ণমালার এক একটি দানা মাত্র। উচ্চস্তরের সাধকরা ইহা ভালভাবেই জানেন যে কালী, দুর্গা বা কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতে হয় না। তাঁহারা ধ্যান করেন ব্রহ্মনাড়ীর। এই ব্রহ্মনাড়ী মর্ম্মকেন্দ্রে বিদ্যমান ৫১টি বর্ণই কালীর মুণ্ডমালা। এই মর্ম্মমালাতে সাধকের ‘আত্মা বা মা সদা সজ্জিতা’।

কালীর উপাসনাই যে বেদান্ত নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা ইহা সাধককে বুঝাইবার জন্য আমরা কালীর গায়ত্রীটির ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কালীর গায়ত্রী :- ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঽঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

অর্থাৎ শ্মশানে বাসকারিণী কালীকে আমরা জানি। আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদিগকে অঘোরে প্রেরণ করুন।

(১) কালিকা। কালিকা এবং ব্রহ্ম যে একার্থবাচক ইহা আমরা এই প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। (২) শ্মশানবাসিনী অর্থাৎ শ্মশানে যিনি থাকেন। শ্মশান অর্থে সমস্ত ধ্বংস হওয়াই যেখানকার নিয়ম এমন স্থান। একটি মাটির ঢেলাকে যদি আমরা ক্রমাগত ভাঙ্গিতে থাকি তবে ইহা ক্রমে ক্রমে অণু পরমাণু ত্রিষরেণু রূপ হইয়া শেষকালে শক্তিরূপে বা গতিরূপে পরিণত হইবে। শক্তির গতি যেখানে স্তব্ধ হয় উহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। স্থূলদৃশ্য, মানসদৃশ্য, জ্ঞানজগতের অনুভূতি সবই ক্রমে ক্রমে ধ্বংস বা সূক্ষ্মতম বা শ্মশান হইতে হইতে আমরা ব্রহ্মজ্ঞান ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করি। একটি অনুভূতি ফুটিলেই আমদের পূর্ণজ্ঞান হইয়া যায় না। সেই অনুভূতিটি ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম হইতে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের ইহাই ক্রম। শ্মশান বাসিনী শব্দের দ্বারা বেদান্তের 'নেতি' শব্দের প্রতিশব্দ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম কি? ইহার স্তন্দর জবাব 'নেতি'। অর্থাৎ এখানেই শেষ নহে। এইরূপ কালী কি? ইহার স্তন্দর জবাব 'শ্মশান বাসিনী'। 'নেতি' ও 'শ্মশান বাসিনী' একার্থ লাচক। (৩) 'অঘোর' অর্থ ন ঘোর। অর্থাৎ অন্ধকার নহে অর্থাৎ জ্ঞান। ইহার আরও সূক্ষ্ম অর্থ করা যায়। আমরা উহা করিবার প্রয়োজন এখানে দেখি না। এখন গায়ত্রীর ঠিক অর্থ দেওয়া যাইতেছে। 'কালিকাকে (ব্রহ্মকে) জানি, তিনি ধ্বংসের যে ক্রম তাহাতে (বা নেতিতে) থাকেন। তাঁহাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদিগকে জ্ঞানের পথে প্রেরণ করুন।'

সৃষ্টির নিয়ম বুঝ, স্থিতির নিয়ম বুঝ, লয়ের নিয়ম জান, তুরীয়ার রূপ প্রত্যক্ষ কর এবং শেষকালে মহাকালী তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ, এককথায় ইহাই কালীমূর্ত্তি। গায়ত্রীরও ইহাই অর্থ।

কালী শক্তিবাদী বঙ্গের একমাত্র উপাস্য শক্তি। বাঙ্গালী জাতি আবার ঐ কালী মন্ত্রের দীক্ষা শিক্ষা ও নির্দ্দেশ নিজেদের সামাজিক জীবনে ফোটাইয়া তোল। তোমাদের দৈন্য কাটিবে।

আজকাল একদল মূর্খ ও বাক্‌সর্ব্বস্য রাজনৈতিক আমাদের দেশে গজাইয়াছেন যাঁহারা বলেন, 'ধর্ম্ম ব্যক্তিগত বস্তু'। এ সব মূর্খগণ জীবনে যে কখনও কোন ধর্ম্মের অনুশীলন করেন নাই তাহা তাঁহাদের কথা শুনিলেই বুঝা যায়। আমরা প্রত্যেকটি শক্তিমন্ত্রে ও বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে 'নঃ' (আমাদের প্রতি বা আমাদিগকে) এই বহু বচনান্ত বাক্যাংশটির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম। একটা সমাজ সমবেত ভাবে কিরূপ কার্য্য করিবে কিরূপ উপাসনা করিবে এবং কিরূপ যুক্তিবাদ পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিবে উহার স্তনির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারা আমাদের ধর্ম্মে বিদ্যমান। শক্তি উপাসনাগুলি সবই সমবেত উপাসনা। অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম্ম ও অত্যন্ত প্রাচীন সমাজ বলিয়া এবং মধ্য যুগে আমাদের সমাজে স্বার্থপর পৌরোহিত্যবাদীদের দ্বারা ধর্ম্মের কুব্যাখ্যা হইয়াছে বলিয়া এবং অদূরদর্শী ভাববাদী মহাত্মাগণের ভ্রান্ত প্রচার হইবার দরুণ আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর যখন আমরা আবার জাগরণের সম্মুখীন হইলাম সেই সন্ধিক্ষণে

আমরা যাঁহাদিগকে নেতা পাইলাম তাঁহারাও আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন চর্চ্চাই করিলেন না বরং কুব্যাখ্যা করিতে একটুও ইতস্তত করিলেন না। এভাবে তাঁহারা দলগত স্বার্থ ও নিজের কর্ত্তৃত্বকে সর্ব্বস্য মানিয়া হিন্দুজাতির অপমান, অসম্মান, নারীর লাঞ্ছনা সবই স্বীকার করিয়া লইলেন। ধর্ম্ম লইয়া আমাদের সমস্যা দেখা দেয় নাই, সমস্যা দেখা দিয়াছে রাজনীতিজ্ঞানে অত্যন্ত অদূরদর্শী নেতাদের নেতৃত্ব ও তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত এক বিচিত্র আদর্শ। সে সঙ্গে কতগুলি ছোকরা ছুকরীর সোসালিজম কম্যুনিজম এর বুলি মার্কা রাজনীতি আমাদের সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আজ আমাদের প্রিয় দেশ বর্ব্বরবাদে জর্জ্জরিত। আমাদের মা বোন পথে ঘাটে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আমাদের দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রায় এক তৃতীয়াংশ দেশ বাসী বিনাদোষে বিনা যুদ্ধে শুধু মূর্খ নেতাদের নেতৃত্বের চাপে বর্ব্বরবাদীদের গোলামে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা আজ নিরাশ ও হতাশ, কিন্তু মূর্খ নেতারা উল্লাসে উৎফুল্ল। দেশের পত্রিকাগুলি সেই সব নেতাদের তোষণে পঞ্চমুখ।

ভদ্রকালী। বেদে কালীকে ভদ্রকালী বলা হইয়াছে। যখন কাল অসুরের অত্যাচার মুক্ত হইয়া মঙ্গলময় হয় সেই সময়ের নাম 'ভদ্রকালী'। সময় যখন প্রতিকূল হয় সেই সময়ের নাম 'রাত্রি'। কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, নবরাত্রি ইত্যাদি রাত্রির উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যে দুর্যোগ কালে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণাষ্টমীকে 'মোহরাত্রি' বলে। যে দুর্যোগে শিব বিষপান করিয়াছিলেন উহার নাম 'কালরাত্রি', উহার অন্যনাম শিবচতুর্দশী। যে দুর্যোগকালে রক্তবীজ বধ হইয়াছিল উহার নাম 'মহারাত্রি'। ইহার অন্যনাম দীপাবলী অমাবস্যা। দেবতারা সত্যযুগে প্রথম দুইবার বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন সেই দুইটি দুর্যোগের নাম 'নবরাত্রি'। শরৎ ও বাসন্তী দুর্গোৎসব উহারই স্মৃতিপূজা। 'রাত্রির' দুর্যোগ শেষ হইলে যে কাল আসে উহার নাম ভদ্রকালী। 'ভদ্রকালী' মানে সমাজের সুসময়। সরস্বতী পূজার মন্ত্রে আছে - ''সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।'' এই দুর্গাপূজার মন্ত্রেও আছে - ''দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' শক্তিপূজা মাত্রই ভদ্রকালীর পূজা। অর্থাৎ সমাজকে রাত্রিমুক্ত করিয়া সুসময়ে লইয়া এসো। এজন্য প্রত্যেক শক্তিপূজার মন্ত্রে 'ভদ্রকালী' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ আছে।

বেদের জন্মভূমি পশ্চিম ভারতে কিন্তু তন্ত্রের জন্মভূমি বঙ্গদেশে। বেদ, ভাষার মধ্য দিয়া কার্য্য, উপাসনা ও জ্ঞান নীতি প্রচার করিয়াছেন। তন্ত্র, মূর্ত্তি শিল্পের মধ্য দিয়া সমস্ত প্রকার সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন উভয়ের সত্যকে আমরা অনুধাবন করি তখন দেখিতে পাই উভয়ের মধ্যে সত্য কিন্তু একইরূপে বিদ্যমান। আমাদের মনে হয় মূর্ত্তি শিল্পের মধ্য দিয়া সত্যের প্রচার অধিক সুন্দর।

কালীপূজা বাঙ্গালীরই মাতৃপূজা। এসো বাংলার সন্তান, আমরা হাজার বৎসরের পৌরোহিত্যবাদ ত্যাগ করি এবং ৫০০ বৎসরের ভাববাদ ভুলিয়া যাই এবং ভদ্রকালীর উপাসনায় সমবেতভাবে আত্মনিয়োগ করি। তন্ত্রের আদেশ - ''স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্'' নিজের দেশই ত্রিভুবন। এসো আমরা আমাদের দেশকে বর্ব্বরমুক্ত করি, সুন্দর করি এবং সকলের জন্য সুখের করি। বাঙ্গালীর কালীমূর্ত্তির আদর্শে ব্রহ্মোপাসনা সার্থক হউক।

শক্তিশালী সমাজের উপাসনা

(১) ব্রহ্মনাড়ীতে আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা শক্তি। ইনি জাগ্রত হইলে আমাদের জীবন শক্তিশালী হয়। ইঁহার ধ্যান করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং কালে গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র মহামন্ত্রাদি পাঠ কর এবং সকলকে করাও। ইহাতে লোক ভেদ, জাতিভেদ, নরনারীভেদ বা কোনও প্রকারের ভেদ সৃষ্টি করিয়া সময় নষ্ট হইতে দিও না।

(২) আমাদের ব্যষ্টিজীবন অত্যন্তই সংক্ষেপ। শরীর শত বৎসরও চলে না, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মজীবন (আত্মা) এবং সমাজজীবন অনন্ত ও অমর। হিন্দুদের সমাজ জীবন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাজ জীবনকে ভুলিয়া ব্যষ্টি জীবনে অধিক আকৃষ্ট হইবার ইহাই ফল হইয়াছিল যে আমরা সমাজজীবনে দুর্ব্বল ও পরাধীন হইয়া পড়িলাম; সুতরাং আমাদের ব্যষ্টিজীবন এবং অধ্যাত্ম-জীবনও পঙ্গু হইয়া পড়িল। সমাজ জীবনকে পুনঃ শক্তিশালী করিয়া লও।

(৩) আমাদের সমাজে উপাসনা দুই প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যথা - (১) নিত্য উপাসনা। (২) নৈমিত্তিক উপাসনা। নিত্য সন্ধিকালে উপাসনা করাকে নিত্য উপাসনা বলে। কালীপূজা, দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতিকে নৈমিত্তিক উপাসনা বলে। আমাদের দেশ হইতে নিত্য উপাসনা এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বিস্তারিত বলিয়া অনেকে সন্ধ্যোপাসনাই করে না। এজন্য খুব সংক্ষেপ করিয়া এই উপাসনা প্রবর্ত্তন করা হইল। যাঁহারা নিত্য বিস্তারিত ভাবে সন্ধ্যোপাসনা করেন তাঁহারাও সন্ধ্যানুষ্ঠানের পর ইহা পাঠ করিবেন। নৈমিত্তিক উপাসনাগুলিও আমাদের দেশে এখন পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নৈমিত্তিক উপাসনাগুলি অনেক বৎসর পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবার দরুন সব মানুষের ও পুরোহিতদের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে নৈমিত্তিক উপাসনায় পুরোহিতরাই অধিকারী; অন্যের অধিকার নাই। এই ধারণা অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়। সকলে শক্তিশালী সমাজের সন্ধ্যোপাসনা আয়ত্ত করিবে। শিব, শক্তি, অবতার, মহাপুরুষ বা যে কোন দেবতার মন্দিরে যাইয়া নিজেরাই এই উপাসনা মন্ত্র পূর্ণভাবে বা অংশমাত্র উচ্চারণ করিয়া জল, ফুল নিবেদন ও প্রণামাদি করিবে।

(৪) শক্তিশালী, দুর্ব্বল ও আসুরিক এই তিন প্রকারের সমাজের মধ্যে শক্তিশালী সমাজই বাঞ্ছনীয়। উপাসনা ত্যাগ করায়, পৌরোহিত্যবাদ প্রবর্তন করায় এবং ভাববাদী উপাসনা প্রবল হওয়ায় আমাদের সমাজ দুর্ব্বল সমাজে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হইবে তাহারা শক্তিশালী উপাসনা নিশ্চয়ই করিবে। ২, ৪ দিন উপাসনা করিলেই বুঝিতে পারিবে ব্রহ্মনাড়ী সহ ধ্যান সহ উপাসনা করিলে মন সতেজ হয় এবং মনে বেশ আরাম হয়। ইহা দ্বারা ভাব শুদ্ধি হয় বলিয়া মুখশ্রী সুন্দর হয়।

গায়ত্রী :- ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

ব্রহ্মস্তোত্রম্ :-
ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽ দ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহাচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপোঽবিনাশ্যঽনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগৎ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪
তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ, তদেকং জগৎ সাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্লুয়াৎ॥

মহামন্ত্রম্ :-
ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥
ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম॥
ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ওঁ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

ব্রহ্মচর্য্যের কয়েকটি নিয়ম

১। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে এবং গৃহের বাহিরে আসিবে। মলত্যাগ ও দাঁতুন করিবে এবং হস্তপদ মুখ নেত্রাদি শীতল জলে ধুইবে।

২। সূর্য যখন আধখানা উদয় হয় সেই সময়ের নাম সূর্য্যোদয়; সেই সময় হইতে পূর্ববর্তী চার দণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কাল। এ সময় গৃহের বাহিরে খোলা স্থানে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং উপাসনাদি সম্পন্ন করিবে। বিদ্যার্থীরা এ সময় উপাসনান্তে পাঠ আরম্ভ করিবে।

৩। রাত্রে শয়নের পূর্বে এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ কালে বাসি মুখে অন্ততঃ আট গণ্ডুষ শীতল জল পান করিবে।

৪। নিত্য সকালে বা বৈকালে একক বা সমবেতভাবে ব্যায়াম করিবে। ব্যয়সাধ্য বিদেশী খেলা হইতে দেশী ব্যায়াম বেশি হিতকারী।

৫। আজকাল ভাইটামিনের বিচারে খাদ্য বিচার করা হইয়া থাকে। ঋষিগণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই প্রকারের খাদ্য-সারের বিচার করিতেন। জ্ঞান বর্ধক আহার

সাত্ত্বিক, কর্মশক্তি বর্ধক খাদ্য রাজস এবং নিদ্রা, রোগ, আলস্য ও অজ্ঞানতা বর্ধক খাদ্য তামস। তামস খাদ্য নিকৃষ্ট।

৬। মাদক দ্রব্যের অভ্যাস করিবে না। যদি ভুল বশতঃ অভ্যাস হইয়া যায় তবে উহা যত্ন দ্বারা ত্যাগ করিবে। চা পান এবং নস্য মাদক দ্রব্যের মধ্যে।

৭। যৌবনে নরের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যৌবনে সংযম-প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল হয়। সংযম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যই দেবত্ব এবং ইহার বিপরীত আচরণ পশুত্ব-মাত্র।

৮। যে সব যুবক কন্যাগণের সঙ্গে এবং যে সকল কন্যা যুবকগণের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করে তাহারা জাগ্রত বা সুপ্ত প্রবৃত্তির বশেই উহা করিয়া থাকে। ইহা নিন্দনীয় অভ্যাস।

৯। যৌবনে যুবকগণের প্রতি যুবকের এবং কন্যাগণের প্রতি কন্যাগণের বন্ধুভাব অত্যন্ত প্রবল হয়। যুবকরা অন্য যুবকগণের চরিত্র গঠনের সহায়ক হইবে। কন্যাগণের চরিত্র গঠনেও কন্যাগণের সহায়ক হইতে হইবে।

১০। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া হতাশ হইও না। সহস্র লোকের মধ্যে একজন মহান হইতে চেষ্টা করেন এবং সহস্র চেষ্টাশীলের মধ্যে একজন মহান হইয়াছেন দেখা যায়। তুমি সেইরূপ একজন কি না কে বলিতে পারে?

১১। নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিয়া তিন সন্ধ্যা কালে বা এক সন্ধ্যায়ও উপাসনা করিবে (বা সন্ধ্যা করিবে) এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ মনে মনে সর্বদা “ওঁ” স্মরণ করিবে।

১২। নিজের নিত্য কর্তব্য এবং নিত্য পাঠ আলস্য না করিয়া নিত্যই সুসম্পন্ন করিবে। স্বাবলম্বী হইবে। রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ যাহাতে শক্তিশালী হয় এ জন্য সচেষ্ট থাকিবে। এই পৃথিবী হইতে অসুর-বাদ ও বর্বর-বাদের মূলোৎপাটন করিবে।

১৩। ঋষি, বেদ এবং আত্মা হিন্দু-ধর্মের তিনটি সুন্দর অবলম্বন। নিজের জীবনকে এই তিনটি সত্যের সহিত সর্বদা যুক্ত রাখিবে। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয়, গ্রামবাসী, দেশবাসী, সকলের প্রতি নিজের শক্তি অনুসারে কর্তব্য-শীল হইবে। চোর, গুণ্ডা, বদমাইস, বর্বর ও অসুরকে সমবেত ভাবে দমনে রাখিবে।

১৪। উপার্জনশীল হইবে এবং বাড়িতে পুষ্প, ফল ও তরকারী উৎপন্ন করিয়া সমাজের শ্রী ও খাদ্য-সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। মাতৃজাতির সম্মান করিবে এবং সহর, পল্লী ও গ্রামের স্বচ্ছন্দতা রক্ষায় মনোযোগী থাকিবে। মিলন ও বিচ্ছেদকালে পরিচিতদের আনন্দ বর্ধনের জন্য “ওঁ নমঃ” বা “ওঁ নমস্তে” “হরি ওঁ” বলিয়া শিষ্টাচার দেখাইবে।

১৫। মনকে আয়ত্তে আনিবার জন্য সহজ যোগবিধান অভিজ্ঞ লোকের নিকট শিখিয়া লইবে। তবেই ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম কার্য্যকরী হইবে।

সরস্বতী অর্চনা ও বিদ্যার্থী সমাজ
(একটি বিশেষ সংকলন)

সরস্বতীই ব্রহ্মচর্য্য শক্তি। গায়ত্রী ও সরস্বতী একই শক্তি। বেদকে এই মূর্ত্তিতে গড়িবার বিধান ঋষিগণ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা মূর্ত্তি নিন্দুক তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। হিন্দুশাস্ত্র বা হিন্দুধর্ম মূর্ত্তিপূজার সমর্থক নহে। জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য মূর্ত্তি একটা কলা বা কৌশল মাত্র। বঙ্গ দেশে বিদ্যার্থী সমাজে সরস্বতী পূজার বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী কৌমার্য্য ব্রতধারিণী শক্তি। বিদ্যাভ্যাসকালে কুমারীদের রূপচর্য্যার বিধান নাই। ইহা সংযমের সময়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, শুচিতা, পবিত্রতা ও ধর্মশিক্ষার প্রবর্তন হওয়া কর্তব্য।

আমরা ছাত্রছাত্রীগণকে বলি তাহারা যেন সরস্বতীপূজাকালে পুরোহিত না ডাকে। সর্ববর্ণের বিদ্যার্থীরা একত্র হইয়া সমবেতভাবে শক্তিবাদীয় নীতিতে পূজার ব্যবস্থা করিবে। কন্যা বিদ্যালয়েও সরস্বতী পূজা হয়। সেখানেও কন্যা বিদ্যার্থীরা পুরোহিত বাদ দিবে এবং সমবেতভাবে নিজেরা পূজা করিবে। পূজানুষ্ঠান খুব আনন্দদায়ক ও উৎসাহদায়ক সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান। ইহা একবার অনুষ্ঠান করিলে প্রতি বৎসর করিতে আগ্রহ হইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় বিপুল উৎসাহে আয়োজন সম্পূর্ণ করার পর সরস্বতী পূজার দিন বহু বিদ্যার্থী ও তাহাদের অভিভাবক সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে কখন একজন পুরোহিত আসিয়া সামান্য পূজা ও পুষ্পাঞ্জলিটুকু করাইয়া দিবে। আমরা সমাজের বিদ্যার্থীদের বলি, যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমরা পূজার আয়োজন কর, কোনরকম কুণ্ঠা না রাখিয়া সেইরূপ সামান্য কিছু মন্ত্র ও পদ্ধতি শিখিয়া লইয়া নিজেরা আনুষ্ঠানিকভাবে পূজায় আত্মনিয়োগ কর। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে তোমরা জাতিভেদ মানো নাই, তেমনি শিক্ষা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজায় জাতিভেদ মানার মূর্খতা ত্যাগ করিয়া পূজায় সকল বর্ণের বিদ্যার্থীরা আত্মনিয়োগ করিবে। পূজার অর্থ পূরণ করা ইহাকে প্রাথমিক তপস্যা ও সাধনা মনে করিবে। পূজারী ব্রাহ্মণের অস্পষ্ট কয়েকটি মন্ত্রের অনুরণন্ পূর্বক পুষ্পাঞ্জলিতে তোমাদের যে তৃপ্তি ও শান্তি হয়, নিজেরা সমবেতভাবে অভ্যাসপূর্বক মন্ত্রপাঠে জানিতে পারিবে ইহাতে কতগুণ শান্তি ও তৃপ্তি এবং মনের গভীরতা বৃদ্ধি হয়। পূজায় বিলাসিতা বা আড়ম্বরে মন দিবে না, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিবে। দেবীর বন্দনার শেষ অংশে বলা হইয়াছে - "নিঃশেষে জাড্য পহা" - তিনি আমাদের সমস্ত জড়তা নষ্ট করেন। আমাদের মুনিঋষিরা স্পষ্টতঃ বুঝিয়াছিলেন মন্ত্রের অনুশীলন ভিন্ন মনের এই জড়তা দূর হইবার নহে। সেইরূপ নির্দ্দেশও দিয়াছিলেন।

দীর্ঘদিন পরাধীনতার ফলে আমরা জাতীয় চেতনা, জাতীয় ভাষা ও চিন্তা স্রোত হারাইয়া ফেলিয়াছি। এবং পদে পদে জীর্ণ লোকাচারের শিকার হইয়াছি। তোমরা সমাজ সংস্কার ও দেশ গঠনে যেমন অনেক লোকাচার ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, তেমনই মনের উন্নত সংস্কারের জন্য ধর্মীয় পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া স্বাধীনভাবে ধর্মপালনে ব্রতী হইবে।

নিশ্চয়ভাবে জানিবে বংশপরম্পরায় নয়, মানুষের অধিকার ও পরিচয় উন্নত সংস্কারবোধ প্রতিভা ও অনুশীলনেই।

সমবেতপূজানুষ্ঠানে কখনও জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে চাঁদা তুলিবে না। এইরূপ চাঁদা তোলা আসুরিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অজ্ঞানতার লক্ষণ। পূজার পূর্বে ‘‘সরস্বতীপূজা মঙ্গলঘট’’ নামে একটি তহবিল করিবে এবং ঘোষণা করিবে নিজেদের আয়ু, আরোগ্য, বিজয়, জ্ঞান ও মঙ্গল কামনা করিয়া সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে এই তহবিলে যাহার যাহা সাধ্য, সেই মতে দান করিবে। পূজার পূর্বদিন তহবিলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা বাজেট করিয়া বাজার করিবে। পূজার জন্য একটি সুন্দরমূর্ত্তি, ঘট ও ঘটের সামগ্রী, ফুল, জল, বেলপাতা, কিছু নৈবেদ্য ও হোমের কাঠ ও ঘি-এর ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সুন্দর পূজা হইবে। নিজেদের সমবেত প্রতিভা দিয়া পূজাস্থল সাজাইয়া লইবে। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা বড় বড় খরচ নিজেরা বহন করিবে।

তোমরা বিদ্যালয়ে যেমন সমবেতভাবে প্রার্থনা ও অধ্যয়ন অভ্যাস কর সেইরূপ পূজাতেও অংশগ্রহণ করিবে। যাহাদের উচ্চারণ স্পষ্ট তাহাদের মধ্যে একজন পূজার বই ধরিবে, একজন পূজায় বসিবে। অন্যেরা সহযোগিতা করিবে। কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট পূর্ব হইতে পরামর্শ ও শিক্ষা লইলে সুবিধা হইবে। প্রচলিত পূর্বপ্রথানুযায়ী যদি পুরোহিত আসেন, তবে তাঁহাকে পাশে বসাইয়া তোমরা শিখিয়া লইবে। তাঁহাকে কিছু সাম্মানিক অর্থ দিবে।

মূল পূজা অনুযায়ী আচমন, আসনশুদ্ধি, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ইত্যাদি করিয়া সংকল্পপূর্বক পঞ্চদেবতার পূজা, অঙ্গন্যাস, পীঠন্যাস, ধ্যান, মানসপূজা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন ও উপচার পূজা করিবে। স্তোত্রপাঠ ও হোম করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ইহার পর উপাসনা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবে এবং যজ্ঞের বিভূতি মাথায় লাগাইবে। সন্ধ্যাবেলা আরত্রিক করিবে। পরে সভা করিয়া নিজেরা সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিবে। চিন্তাশীল জ্ঞানীব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জানাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে। নিজেদের প্রতিভার অনুশীলনে নৃত্যগীত, যোগাসন, অঙ্কন, রচনা, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি প্রদর্শন করিবে। এইরূপ পূজানুষ্ঠানে কোন ত্রুটি দেখা দিলে বিচলিত হইবে না। সংশোধন করিয়া পরের বৎসর আবার অনুশীলন করিবে।

যদি বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করিতে প্রথম প্রথম অসুবিধা বোঝ তবে সরস্বতীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি, প্রণামমন্ত্র ও স্তোত্রপাঠ সমবেতভাবে করিবে। পরে হোমাগ্নি প্রজ্বলন করিয়া ঘৃত সহিত শুষ্ক সমিধ (কাষ্ঠ) তাহাতে প্রত্যেকে ‘‘ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ’’ মন্ত্রে প্রদান করিবে। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে ক্রমে সবই আয়ত্ত করিতে পারিবে। হিন্দু আর্য্যকুলে জন্মকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে অনুভব করিবে। উন্নত শিরে নিজেরা জানিবে - বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও ভাষা।

সরস্বতী পূজা আয়ত্ত হইলে ক্রমে সকল দেবদেবীর একই নিয়মে পূজা করিতে পারিবে।